পিপলস প্রটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ / জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জনগণের প্রস্তাবনা

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক দিকসমূহ ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। এর জন্য প্রয়োজন দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। গত ৫০ বছরের বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ তাপমাত্রা বেড়েছে দ্বিগুণ হারে। এবং আগামী দশকে বৈশ্বিক তাপমাত্রা আরো কয়েকগুণ হারে বৃদ্ধি পাবে। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম সময়কাল। জলবায়ুর এ পরিবর্তন পৃথিবীর স্বাভাবিক জলবায়ুকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস করছে; মানুষের জীবনজীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের জীবনজীবিকাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।

মানুষ সৃষ্ট অত্যধিক পরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের কারণে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। ফলে মারাত্মকভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে। কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরিত হয়। অন্যদিকে বন উজাড় হয়ে যাওয়ার ফলে পরিবেশ আরও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর জলবায়ুতে ৬৫০,০০০ বছর আগে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছিল, এখন এর পরিমাণ অনেকগুণ বেশি। কৃষি ও শিল্প কলকারখানা থেকে নিঃসরিত মিথেন ও নাইট্রাস- অক্সাইডের পরিমাণও বেড়ে গেছে যা বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের জনগণ তাপদাহ ও ব্যাপক বৃষ্টিপাতের মুখোমুখি হচ্ছে। এছাড়াও ঘনঘন ঘূর্ণিঝড়ও দেখা দিচ্ছে। আফ্রিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা কৃষিযোগ্য ভূমি নষ্ট হচ্ছে, কৃষিতে উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং দেখা দিচ্ছে বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতা। আফ্রিকাতে খরা, ক্ষুধা ও দূর্ভিক্ষের নিয়মিত ঘটনা। ইতিমধ্যে এশিয়াতে বন্যা ও ভূমি ধসের সংখ্যা বাড়ছে। দক্ষিণ আমেরিকাতে তাপদাহ আর প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আদিবাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, নিচু এলাকাগুলি পাবিত হচ্ছে। একই সাথে সমুদ্র উপকূলবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনজীবিকাও বিপন্ন হচ্ছে।

গত শতক ছিল মানবজাতির প্রযুক্তিগত উন্নয়নের চূড়ান্ত শতক। একদিকে পৃথিবীর সুবিধাবাদী গোষ্ঠির মুনাফালোভী মানুষেরা উৎপাদন আর ভোগে লিপ্ত। অন্যদিকে মানবজাতির বিরাট অংশ ক্ষুধা, দারিদ্র্য তথা মানবেতর জীবন যাপন করছে। পৃথিবীর বড় বড় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই সুবিধাবাদীদের অন্যতম। কাজেই যেমন করে উত্তরের শক্তিশালী দেশগুলো এক সময় দক্ষিণের সম্পদ ও মানুষকে ব্যবহার করে ধনী হয়েছে, তেমনি উত্তরের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন দক্ষিণের বাজার দখল করে মুনাফা লুটছে। শোষণ, কাঠামোগত দারিদ্র্য এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার মূলে রয়েছে প্রবৃদ্ধি ও মুনাফার তাড়না।

পৃথিবীর সচেতন নাগরিকগোষ্ঠি বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবেলা করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন ১৯৯২ সালের ল্যান্ডমার্ক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি এবং পরবর্তীতে কিয়োটো চুক্তি। দুঃখজনক যে, কিয়োটো চুক্তির তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। কিয়োটো চুক্তি সুনির্দিষ্ট করে বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মুনাফার কথা উলেখ করেনি। বরং চুক্তিটিতে জ্বালানি সম্পদের বাজারজাতকরণ এবং সরবরাহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সৃষ্টির পেছনে যাদের দায়-দায়িত্ব রয়েছে সে বিষয়টি অবহেলিত হয়েছে। বাণিজ্য নির্ভর কার্বন নির্গমন ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে নতুন ধরনের নির্ভরতা, আর সহযোগিতার নামে দূষণের ক্ষেত্রকে করেছে প্রসারিত। মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা অর্জনের সুযোগ পেয়েছে। উন্নত ধনী দেশ ও তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সহযোগিতার নাম করে দক্ষিণে তাদের ব্যবসা বাড়িয়েছে। দক্ষিণের অভিজাত ও রাজনৈতিক গোষ্ঠিকে হাত করে তেল, গ্যাস ও অন্যান্য কোম্পানিগুলো মুনাফা লুটছে আর একই সাথে পরিবেশ দূষণ করছে।

কিয়োটো প্রোটোকল দক্ষিণের দরিদ্র ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির কথা পরিস্কার করে বলেনি। জলবায়ু পরিবর্তনে এদের জীবনজীবিকা ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বভৌমত্ব এবং সম্পদের উপর মানুষের অধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে উলেখ করা হয় নি।

সমস্যার গভীরতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী বড় ধরনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তন এমন একটি বিষয় যেখানে একজন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের একক প্রচেষ্টায় কিছু করা সম্ভব না। সম্মিলিত ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ ছাড়া এ সমস্যার মোকাবেলা করা কঠিন। কাজেই শুধুমাত্র এ মুহূর্তে গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা পরিমিত পর্যায়ে এনেও বৈশ্বিক উষ্ণতা ও এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ জলবায়ু পরিবর্তন দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে। কাজেই দরিদ্র্য জনগোষ্ঠি যে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির শিকার হবে সে ব্যাপারে বৈশ্বিক পদক্ষেপ ও দায়-দায়িত্ব নিতে হবে।

'পিপলস্ প্রোটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' বা জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জনগণের প্রস্তাবনার নীতিগুলো মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপসমূহের আলোকে জন-মানুষের সংগ্রামের দিক নির্দেশনা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির দিকটিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এতে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জনগণের প্রস্তাবনার মূলনীতিসমূহ

সারা দুনিয়ার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে এক হয়েছে। এই প্রস্তাবনায় যে বিষয়গুলোতে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান, মর্যাদাবোধ, আবহাওয়ার প্রতি সম্মান, অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন, সমতা, সার্বভৌমত্ব প্রভৃতি।

১. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমস্যার মূল কারণ হিসেবে যেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণের ক্ষমতার পার্থক্য, অভিজাত গোষ্ঠির দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অধিকাংশ দুস্থ জনগোষ্ঠির দুর্ভোগ। এই বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১.১. জলবায়ুর পরিবর্তনকে শুধুমাত্র পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। এ সমস্যার প্রধান কারণ হলো পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনীতি আর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তি মুনাফা এবং সম্পদ আহরণকে উৎসাহিত করে।

১.২. বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতি মূলত ধনী দেশ ও তাদের বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরাই মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, সম্পদের অবলুপ্তি, জ্বালানি সম্পদের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার এবং গ্রিনহাইজ গ্যাস নিঃসরণের মূল হোতা।

১.৩. আমরা নিন্দা জানাই মুক্তবাজার ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নকে। এই ধারা দক্ষিণে বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসনকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি এই ধারা অর্থনীতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঢুকে পড়েছে।

১.৪. আমরা বিশ্বাস করি যে, উত্তরের ক্ষমতাবান সরকার মুক্ত বাজার অর্থনীতি জনগণের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আর তা করছে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এদের অন্যতম। এছাড়াও আছে মুক্ত বাণিজ্য নীতি, বিনিয়োগ চুক্তি এবং দাতাদের শর্ত।

১.৫. আমরা অনুধাবন করছি যে দক্ষিণের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য দায়ী মূলত উত্তরের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। তারা তাদের জ্বালানি নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে দক্ষিণের দেশগুলোতে। যাতে করে এসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্থানীয় শ্রমিক সহজে ব্যবহার করতে পারে। আমরা আরও অনুধাবন করছি যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার বনগুলো উজাড় হওয়ার জন্য এ বহুজাতিক কোম্পনিগুলোর ক্ষনন কার্যক্রম, বাঁধ প্রকল্প, যান্ত্রিক ব্যবস্থা, কৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি দায়ী।

২. সার্বভৌমত্ব মূলত জনগণের শক্তি যা সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। জলবায়ু পরিবর্তনও এরকম একটি পৃথিবীব্যাপী সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে সত্যিকার অর্থে একটি অংশগ্রহণমূলক কাঠামো যা জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটিতে বৈশ্বিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

২.১. পৃথিবীর যে সকল জনগোষ্ঠি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, আমরা তাদের অগ্রাধিকার দিচ্ছি। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য বিষয়ে স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ের সমাবেশগুলোতে এই ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির বিষয়ে দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

২.২. এই আন্দোলনে নাগরিক সমাজ এবং জনমানুষের সংগঠনগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদের সংগ্রামই হল মূল চালিকা শক্তি। আমরা মনে করি জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় জনমানুষ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষার আন্দোলনে জয়ী হবে।

২.৩. আমরা জানি যে, উত্তর এবং বিশেষ করে দক্ষিণের দেশগুলিতে গণমানুষ শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। অভিজাত গোষ্ঠি এবং ধনীক ও বণিক প্রতিষ্ঠানগুলো বরাবর প্রভাব বিস্তার করে আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণের উপর।

৩. আবহাওয়ার প্রতি সম্মানবোধ এ কথাটির অর্থ হল মুক্তবাজার ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করা, যে বাজার ব্যবস্থা পরিবেশগত গুরুত্বের উপর টাকার কর্তৃত্ব আরোপ করে। পৃথিবী এবং মানুষের প্রয়োজনকে প্রবৃদ্ধি ও মুনাফার চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৩.১. আমরা স্বীকার করি যে, মানব জাতির উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন আছে। আমরা এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেখানে মানুষ সকল মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করবে। এই প্রক্রিয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঞ্চিত করবে না।

৩.২. কিছু স্বার্থলোভী গোষ্ঠি নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পৃথিবীর সম্পদ যাচ্ছেতাই লুণ্ঠন, শোষণ, বিক্রি বা আহরণ করতে পারবে না। এই পৃথিবী ও মানুষকে বিশ্ব পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মুনাফার উপরে স্থান দিতে হবে।

৩.৩. পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে, সাথে সাথে প্রকৃতির উপর মানুষের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু তা যদি কিছু মানুষের মুনাফার লক্ষ্যবস্তু হয় তাহলে সংকটের সৃষ্টি করে। উলেখ্য, উৎপাদন, ব্যবহার এবং ভোগ যদি মানুষের প্রয়োজন নির্ভর হয় তাহলে এ সম্পদ যথেষ্ট।

৪. উত্তরের ধনী দেশগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের বিষয়টিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। যদিও লক্ষ্য এক তবুও দায়-দায়িত্ব বন্টন করা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার এমন একটি পদ্ধতি যা বিশ্বব্যাপী ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।

৪.১. আমরা স্বীকার করি যে, দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৪.২ সমাজের অভিজাত শ্রেণীকেই উদ্ভুত সমস্যার দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা অবগত আছি যে, সকল সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভোগের পরিমাণ অনেক বেশি।

৪.৩. সব ধরনের পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টায় কৃষক সমাজ, আদিবাসী, উপকূলবর্তী জনগণ, জেলে প্রভৃতি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমরা উপলব্ধি করি যে, মানবতার একটি বড় অংশ প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু, এবং সর্বোপরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

৪.৪. আমরা অবগত যে, অভিযোজনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক সমস্যা মোকাবেলায় ত্রাণ কার্যক্রমে অভিযোজন সহায়ক হবে। এ প্রক্রিয়া ততক্ষণ চলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন প্রক্রিয়াকে রোধ করা যাচ্ছে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১. আমরা স্বীকার করি যে, জলবায়ু পরিবর্তন একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহকে মোকাবেলা করতে হবে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে।

২. আমরা আমাদের মূলনীতির মাধ্যমে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার উলেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যেকোন আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি আমরা সহযোগিতা ও সমর্থন জ্ঞাপন করি। তবে তা অবশ্যই এই ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪. এই সমস্যাটি শুধুমাত্র অভিযোজন বা চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে সমাধানযোগ্য নয়। সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোকে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই করতে হবে।

৫. কিয়োটো প্রোটোকলে কিছু মৌলিক দূর্বলতা রয়ে গেছে এবং এ দূর্বলতাগুলো আগামীতে নতুন কোন প্রটোকল বা ২০১২ সালের পরবর্তীতে কোন চুক্তিতে পুনরায় নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

ক) আমরা বাজার নির্ভর পদ্ধতিতে এ সমস্যা মোকাবেলা করার ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করি ।

খ) প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে শুধু প্রযুক্তিগত সমাধান যথেষ্ট নয় এবং তা আমাদেরকে সমস্যার মূল কারণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৬. মানব উন্নয়ন তথা তাদের জীবনজীবিকা ও কল্যাণের জন্য এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে যা সামাজিক ন্যায্যতা, সার্বভৌমত্ব ও পরিবেশবান্ধব নীতি অনুসরণ করে। জনমানুষ কেন্দ্রিক কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত।

৭. আমরা ঘোষণা করছি, স্থানীয় জনগণ প্রাকৃতিক সম্পদে তাদের মালিকানা অর্জন করবে এবং তা ব্যবহার করতে পারবে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, সরকার বা অন্য কোন মহল যারা বিশ্বব্যাপী অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে তারা এ সকল জনগোষ্ঠিকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

৮. আমাদের করণীয়ঃ

ক) জাতীয় সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা।

খ) জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা জনগণ ও স্থানীয় গোষ্ঠীর সমন্বয়ে প্রান্তিক পর্যায়ে সম্পদের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে ।

গ) প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন ও ব্যবহারের সকল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) একটি যুগোপযোগী জাতীয় নীতি কাঠামো থাকতে হবে।

ঙ) টেকসই প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য একটি জাতীয় প্রকল্প থাকবে।

চ) শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য ও সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ছ) অন্যান্য দেশের সাথে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন নদী, সমুদ্র, বন, পরিবেশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে অংশীদারিত্বমূলক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯. তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষা এবং সর্বোপরি সামাজিক রূপান্তরের জন্য বিকল্প চিন্তা ও উপলব্ধির কোন বিকল্প নেই। জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে ও উদ্বুদ্ধ করতে সরকারের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. এই সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের বিরুদ্ধে দিনে দিনে পুরো বিশ্বে স্থানীয় পর্যায়ের আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. আমরা দাবি জানাই যে, দক্ষিণের গণমানুষের ক্ষয়-ক্ষতির জন্য উত্তরের দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানও দিতে হবে। আমরা বিশ্ব ব্যাংক ও অন্যান্য দাতাদের ভ্রান্ত সহায়তার সমালোচনা করি। তাদের অভিযোজনমূলক তহবিল আমাদেরকে মূল সমস্যার সমাধান থেকে দুরে সরিয়ে রাখে। দাতারা অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্স-এর আওতায় যে পরিমাণ অর্থ যোগান দেয় তার চেয়েও বেশি অর্থ তাদেরকে দিতে হবে অভিযোজনমূলক তহবিলে।

১২. প্রকৃত অভিযুক্তদের বিচার নিশ্চিত করতে দেশ ভিত্তিক বিবেচনা না করে বরং মাথাপিছু ভিত্তিতে এই গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ হিসাব করা দরকার। উত্তরের ধনী দেশ, তাদের বহুজাতিক কোম্পানি এবং দক্ষিণের অভিজাত গোষ্ঠী যারা সুবিধা লুটছে তাদেরকেই মূলত এ দায়ভার গ্রহণ করতে হবে।

ক) জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কমাতে হবে এবং জ্বালানির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণের দেশগুলো যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তা পুষিয়ে নিতে উত্তরের দেশগুলোকে শর্তহীন অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) টেকসই উন্নয়ন এবং দক্ষিণের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে উপর লক্ষ রেখে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হবে। এবং উত্তরের দূষণকারী শিল্পকে দক্ষিণে স্থানান্তর বন্ধ করতে হবে।

১৩. আমরা উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর ব্যাপারে অবগত ও একমত। এবং তা বাস্তবায়নে একটি বড় অংকের বাজেট তৈরি করতে হবে এবং সেই সাথে পদ্ধতিগত কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে যার মাধ্যমে ধনী দেশগুলো গরিব দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেবে। এই বৈশ্বিক তহবিলে মূলত ধনী দেশ এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থের যোগান দিতে হবে।

যোগাযোগ : ভয়েস, বাড়ি ৬৭, বক-ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১৫৮৬৮৮